কীর্তন

"নামলীলা বিহারাণাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্"

কীর্তন শব্দের আভিধানিক অর্থ গুণকথন বা যশঃখ্যাপন। কোন মহাজনের গুণ, যশ ও কীর্তিগাথাই কীর্তন গান। সাধারণ ভাবে কীর্তন বলতে আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলার মহিমাপ্রকাশক গানকেই বুঝে থাকি। কীর্তনকে কী-রতন ভাবলে আমরা সঙ্গীতের কী বিশেষ রত্ন এর মাঝে লুক্কায়িত আছে সে কথাটি ভাবতে পারি। কীর্তনীয়া ও ভাবুক শ্রোতা মাত্রেই জানেন যে কীর্তনে সঙ্গীতের কোন বিশিষ্ট রত্ন রয়েছে। কীর্তনের কথায় আমরা সংকীর্তন কথাটিও পেয়ে থাকি। কীর্তন ও সংকীর্তন প্রায় একই অর্থ-বাচক। সংকীর্তনকে 'সমবেত-গুণগাথা-সঙ্গীত" বলা যায়। নামগান যখন বহুজনে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকেন তখন তাকে বলা হয় **সংকীর্তন**। বহুজনে একত্রে কীর্তন করতে করতে যখন নগর পরিক্রমা করেন তখন এই সমবেত কণ্ঠের কীর্তনকে **নগর-সংকীর্তন** নামে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত কীর্তিলহরী গান থেকেই বর্তমানের কীর্তন গান এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ভেবে থাকেন, আবার অনেকে একথা স্বীকার করেন না। মহাপ্রভুর কৃপায় বাংলাতেই কীর্তন গানের প্রচলন বেশী। সেই কারণে অনেকে কীর্তনকে বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সঙ্গীত বলে মনে করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত।"...

"কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলার। যেজন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়।"—সংগীতচিন্তা।

"বাঙ্গালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ ও ফোক ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহু শাখায়িত নাট্যরস আছে, তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।" সুর ও সংগীত—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব উচ্চাঙ্গ ও বৃহদঙ্গ এই সঙ্গীতকে কাব্য-সঙ্গীত, নাট্য-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, ভাব-সঙ্গীত প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। সুর ও ভাবের সুষমায় ভরা, কথার ওপর কথার জাল বুনে একে আবেগে ভরিয়ে তোলা হয়। তালকে মান্য দিয়ে রাগকে সম্মান জানিয়ে, হৃদয়াবেগ ও গভীর ভাবানুভূতিতে ভরা এই ভাব-সঙ্গীত, লীলা কীর্তনে মহান নাট্য-সঙ্গীতের আকারেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কীর্তনে রাগ মানা হলেও রাগের নিজস্ব মেজাজকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির ওপর নির্ভর করে ভাব রসে ডুব দিয়ে এখানে আমরা রাগ-রসকে গৌন করি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি না থাকলে, তাকে একান্ত আপনজন বলে ভাবতে না পারলে কীর্তনে সত্যকার রস সঞ্চার করা সম্ভব হয় না। কীর্তনের মতিগতি, তার প্রাণ, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের। গভীর হৃদয়াবেগই এর সর্বস্ব। সেই আবেগের স্রোতে রাগ নিজেকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। রাগ এখানে গৌণ, প্রেমাশ্রিত ভাবাই এখানে মুখ্য। কীর্তনের গায়ককে ভাবানুযায়ী ভাষার প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই গায়কের এই অধিকার নাই। কীর্তনের ভাষা, তার সুর, তার আবেগ, তার ধর্মভাব প্রভৃতি সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশও পৃথিবীর কোন দেশের কোন সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। এটিই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য।

অনেকের ধারণা যে কীর্তনের জন্মকাল শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব কীর্তনের এক বিশেষ ভাবধারার স্রষ্টা ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, তাঁর আগে সকলের সামনে কীর্তনকে এভাবে কেউ তুলে ধরতে পারে নি। আর কোন মহাজনই বাংলার সর্বসাধারণকে কীর্তনের ভাবে এমন মাতিয়ে তুলতে পারেন নি, তাই শ্রীচৈতন্যদেবকেই সকলে কীর্তনের স্রষ্টা বলে মনে করেন। প্রাক-চৈতন্যযুগেও কীর্তন গানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান করা হত। যতদূর জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিক থেকেই বাংলা দেশে কীর্তন গানের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

কীর্তনের দুটি বিভাগ, প্রথমটি হল নাম-কীর্তন বা নাম-সংকীর্তন, আর দ্বিতীয়টি হল লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে"; "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ, প্রভৃতি নাম-গানকেই নাম-কীর্তন বলা হয়। দীনতাসূচক গান, আত্মনিবেদনাদি বিষয়ক গান বা প্রার্থনাদিকে নাম-

সংকীর্তনের মধ্যে ধরা হয়। নাম কীর্তনে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তাই বৈষ্ণব সাধক মাত্রেই নাম কীর্তনের অভিলাষী, এখানে রাগ, তাল, সুর, লয়ের অপেক্ষা নামই প্রধান, যদিও এগুলি বিভিন্ন তালে বা ভিন্ন ভিন্ন সুরে গাওয়া হয়। এটি সাধনার সহজ অঙ্গ, তাই সাংগীতিক মূল্যে নাম-কীর্তনকে যাচাই করা যায় না।

দ্বিতীয়টি হল রস-কীর্তন—রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, তাঁদের রূপগুণ বর্ণনা, তাঁদের প্রেমলীলা প্রভৃতির বর্ণনা বা প্রশংসাদির বিষয়ই লীলা-কীর্তনের অঙ্গ। এই লীলা-কীর্তনের উচ্চতর গীতশৈলীর ঐতিহাসিক বিকাশ প্রথম ঘটে খেতরির রাজা শ্রীসন্তোষ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় খেতরির মহোৎসবে। শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ সম্বন্ধে তাঁহার "কীর্তন গীত প্রবেশিকায়" (১৩৪৮) লিখেছেন "খেতরির মহোৎসব হইতেই কীর্তনের প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। এরূপ সাধু সজ্জন ভক্ত ভাবুক রসিক গায়কগণের সমাবেশ বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে এই উৎসবে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং খেতরি যে ভাব-বন্যা আনিয়া দিল, তাহার প্রেরণায় অগণিত ভক্ত কবি, গায়ক, বাদক এই নূতন ভাবের মাদকতায় এক শতাব্দীর অধিক কাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্যের পরে এরূপ ভাবোদ্দীপনা আর হয় নাই। কীর্তন-সঙ্গীতের উচ্চতম শিখর এই খেতরিতেই অগণিত গুণীগণ সমাবেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানকালেও তাহারই ধারা চলিয়া আসিতেছে"। আবার বিশ্বভারতীর প্রকাশনে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহে তাঁর লেখা "কীর্তন" বইটিতে ২৫ পৃষ্ঠায় খেতরির মহোৎসবের কথায় আরও লিখিয়াছেন "গোপালপুরের জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে গণ্য হন……তিনি তাঁর জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিলে তাঁর পিতৃব্য পুত্র সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গ্রাম প্রান্তে কুটির নির্মাণ করিয়া সেখানে ভজন সাধনে জীবনাতিপাত করেন"। এই নরোত্তম দাস ঠাকুরই খেতরির মহোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এখানে ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পরই বৈষ্ণব জগতের সমস্ত মান্যগণ্য মহাপুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গৌরচন্দ্রিকা অর্থে গৌরাঙ্গ বন্দনা সহ প্রাচীন ধ্রুপদ গানের ভিত্তিতে লীলা কীর্তনের এক নূতন ধারা ঠাকুর নরোত্তম দাস কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়।

ধ্রুপদ বা খ্যাল গানের ঘরাণার মত কীর্তনেও চার পাঁচটি ঘরাণার নাম পাওয়া যায়। এগুলি বাংলা দেশের এক একটি স্থানের নামেই নাম পেয়েছিল। (১) **গরাণহাটি** ষ্টাইল—রাজসাহী জেলার গড়েরহাট থেকে এসেছে। (২) **মনোহরসাহী**—বর্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণা থেকে এসেছে। এই দুই ষ্টাইলই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ ধরণের, এই মনোহরসাহী ষ্টাইল শ্রীনিবাস আচার্যের আবিষ্কৃত বলা হয়। মনোহরসাহী ষ্টাইলে নানা কাজ, মীড়, তান, মধুর বিস্তার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য শোনা যায়। (৩) **রেনেটি ষ্টাইল**—রাণীহাটি পরগণা থেকে এসেছে। মনোহরসাহী ও রেনেটি একই সময় থেকে প্রচলিত। (৪) **মন্দারিণী**—মেদিনীপুর জেলার গড় মান্দারণ থেকেই এর জন্ম। এই চার রকমের ঢঙ আজকের দিনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রচলিত নাই। কোন গায়কই আজ কোন একটি ঢঙে আবদ্ধ থাকেন না। পূজ্যপাদ পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী, যিনি কীর্তন জগতে "পণ্ডিত বাবাজী" বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বিশেষ বিশেষ ঘরানার চাল নানা জায়গায় ঘুরে শিখে এসেছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে কাশিমবাজার রাজভবনে রেখে কীর্তনের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। কীর্তনের আর এক ঘরাণা **"ঝাড়খণ্ডী"** নামে পরিচিত, মেদিনীপুরের ঝাড়খণ্ড গ্রাম থেকেই এই চালের উৎপত্তি, বর্তমানে এই ঘরানার গান আর শোনা যায় না।

কীর্তনে ময়নাডাল : "আজকাল ময়নাডালের কীর্তন" কথাটি শোনা যায়। ময়নাডাল বীরভূমের একটি গ্রামের নাম, সেই নাম থেকেই ময়নাডাল কথাটি এসেছে। এটি কীর্তনের একটি ঘরানার নাম। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রসরাজ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ই এই ঘরানার প্রবর্তক। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখানেও রসরাজ মিত্র ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কীর্তনের বিদ্যালয় স্থাপন করে বহু ছাত্রকে কীর্তন শিখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেকের ধারণা অদ্বৈত দাস বাবাজীও মিত্র ঠাকুরের ঘরে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বর্তমানে এই ঘরানার ধারক ও বাহক নবগোপাল ও গোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয়েরা এই ধারায় কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন।

কীর্তনের কাব্য : কীর্তন গানের কবিতাকে "পদাবলী" বলা হয়। সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে আমাদের অমর মহাকবি জয়দেবই সরল সংস্কৃতে প্রথম পদাবলী রচনা করেন। তাঁর লেখা গীত-গোবিন্দে পদাবলীগুলি পাওয়া

যায়। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈথিলী ও বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন। তৎপরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির অনুকরণে "ব্রজবুলি" ভাষায় ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে বাংলা ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত (গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম, বাসু ঘোষ প্রভৃতি) বহু পদাবলী রচয়িতারা কীর্তনের অসংখ্য পদাবলী রচনা করেছেন।

কীর্তনের রাগ ও সুর : কীর্তনের সুর এক বিশেষ ঢঙে রচিত। কামোদ, গৌরী, ভীমপলশ্রী, ধানশী বা মায়ুর প্রভৃতি বিশেষ রাগের নাম কীর্তনের সুরে পাওয়া যায়। এর মধ্যে "মায়ুর" কীর্তনের এক বিশেষ মিশ্র সুর, যাতে বেহাগ, খাম্বাজ ও ঝিঁঝিটের মিশ্রণ দেখা যায়। অনেকে বলেন শ্রীরূপ গোস্বামীর সময় থেকেই এই বিশেষ সুর প্রচলিত হয়েছে। এই সব রাগে রচিত কীর্তনের সুরগুলির একটি বিশিষ্ট ধরণের রূপ আছে।

কীর্তনের জাত সুর : আগের দিনের নামকরা কীর্তন গায়ক ও সুর রচয়িতা মহাজনেরা কয়েকটি গানে অনেক চিন্তা করে যে ভাবের সুরারোপ করে গেছেন সেগুলি "দাগী" গান বলে চলে আসছে এবং সেই বিশিষ্ট গানের বিশিষ্ট সুরগুলিকে "জাত সুর" বলা হয়। অভিজাত বৈষ্ণব সমাজে এই মহাজন প্রদত্ত সুরগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কোন কীর্তনীয়া যদি এই সব দাগী গানের জাত সুর লংঘন করেন, তবে তাঁরা কীর্তন সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে থাকেন। কোন কীর্তন সমাজই দাগী গানের সুরের অদল বদল অনুমোদন করেন না। স্বর্গীয় ভাক্তার অমিয় সান্যাল মহাশয় বলেছেন যে—কীর্তনের এই জাত সুরগুলি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত জাতিরাগের কায়দার অন্তর্ভুক্ত।

কীর্তনের তাল : কীর্তনে বহু প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে দশকুশী (ছোট ও বড়), ডাঁশ পাহিড়া, দাসপ্যারী বা ডাঁশ পেড়ে, জপতাল, ধামালি, দোঠুকী, ছোট দোঠুকী, তেওট, কাটা ধরা, একতাল, দোজ, ঝাঁতি, লোফা প্রভৃতির নামই শোনা যায়।

কীর্তনের সঙ্গতে বাদ্য যন্ত্র : কীর্তনে শ্রীখোল ও করতাল ব্যতীত আর কোন বাদ্যযন্ত্র অনুমোদন করা হয় না। কণ্ঠনিঃসৃত স্বরকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কীর্তনের আখর : হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে উপস্থিত মত স্বর রচনা করে রাগের বিস্তার করা হয় রাগের সৌন্দর্য বাড়ানোর কারণে; কীর্তনেও স্বর বিস্তারের সঙ্গে ভাবের অনুকূলে, বিনা পূর্ব প্রস্তুতিতে উপস্থিত মত বাক্য রচনা করে ভাবকে গভীরতর করা হয়। গানে এইভাবে ভাষার অর্থে অক্ষরের বিস্তারকেই আখোর আখ্যা দেওয়া হয়। এতে গায়কের স্বতন্ত্রতা, তার কবিত্ব শক্তি, তার রসজ্ঞান এবং লয়-বোধ প্রভৃতির গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের বিস্তারে ও তানে গায়কের গুণপনার পরিচয় মেলে, কীর্তনের আখরে তেমনি কীর্তনীয়ার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কীর্তনের সহিত সঙ্গতের ধারা : হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মত অতি কঠিন ভাবে লয় মেনে চললে কীর্তনে কখন কখন তাল লয়ে ছোট বড় হতে দেখা যায়। আগেই বলেছি কীর্তন ভাবপ্রধান গান, ভাবের আতিশয্যে সময় সময় এতে তাল কাটা অসম্ভব নয়। কীর্তনের সঙ্গতে তাই দক্ষ খোল বাজিয়ের দরকার, যিনি সহজেই গাইয়ের ভাবের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে যথাস্থানে ঘা দিতে পারবেন। গভীর ভাবাবেশে খোল বাজিয়ে "লহর" বাজাবেন। অক্ষরে অক্ষরে ভাবের পরিপূর্ণতার সময় মাতান বাজিয়ে মান পাড়বেন এবং আখরের সময় বাজাবেন "কাটান", গানের সঙ্গে এই ভাবের সঙ্গত হলে তবেই শ্রোতারা আনন্দ পাবেন, গানটি রসভাবে ভরপুর হয়ে উঠবে, কীর্তনীয়াও আনন্দে মেতে উঠবেন এবং নূতন নূতন আখরে ও সুরের সূক্ষ্ম জাল বুনে গানকে উচ্চস্তরের করে তুলবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বাদ্য হবে গীত অনুযায়ী, তার ভাব হবে ভাষার অনুকূল এবং গীতের অনুসরণকারী, তবেই গানের মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে।

ঢপ কীর্তন : বাংলার যশোর (যশোহর) জেলার মধুসূদন (কিয়র) কান নামে এক প্রতিভাবান গায়কই এই চালের প্রবর্তক। উনিশ শো শতাব্দীর মাঝামাঝি ঢপ কীর্তনের জন্মকাল। এটিও রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। গানে কীর্তনের ছাপ থাকলেও এর প্রকাশভঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী থাকে যে কারণে একে সহজেই কীর্তন থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এতে রাগের ব্যবহার ও চলন রক্ষা করা হয়। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে সুরে কথা বলার রীতিও রয়েছে। বর্তমানে এ গান আর বিশেষ শোনা যায় না। এটিকে কীর্তনের এক প্রকার সরল রীতি বলা চলে।

বাউল : বাউল শব্দটি বাতুল শব্দ থেকে বা হিন্দি বাওরা শব্দ থেকে এসেছে। বাতুল বা বাওরা শব্দের অর্থ পাগল। বাসুর মত ঈশ্বরের সঙ্গে